

ঐতিহাসিক উপন্যাস

মার্শিয়া

দানিয়েবের রক্তদানব



রুকাইয়া মাবরুয়া

ঐতিহাসিক উপন্যাস

মার্শিয়া

দানিয়ুবেৰ রক্তদানব

ৰুকাইয়া মাৰুৱা



IFFAH
PUBLICATIONS



প্রকাশকের কথা

যুগ যুগ ধরে সাহিত্যই একটা জাতির কল্পনাসক্তি, ইতিহাস এবং আত্মপরিচয়ের দর্পণ হিসেবে কাজ করে। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে মৌলিক ঐতিহাসিক সাহিত্যের যে শূন্যতা তৈরি হয়েছে, তা আমাদের নতুন প্রজন্মকে নিজেদের গৌরবোজ্জ্বল অতীত থেকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে। ঠিক সেই দায়বদ্ধতা ও উন্মাহর প্রতি গভীর ভালোবাসা থেকে ইফফাহ পাবলিকেশন-এর পথচলা।

সম্মানিতা রুকাইয়া মাবরুয়া আপুর ‘মার্শিয়া’ এমন একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস; যা আমাদের হারানো অতীত ও আত্মপরিচয়ের স্ফুলিঙ্গ পুনরুজ্জীবিত করার এক দরদি প্রয়াস। লেখালেখির অঙ্গনে রুকাইয়া আপুকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কিছু নেই। মূলত এম. এ. সাদেক হুসাইন সিদ্দিকির উর্দু রচনার ভিত্তিকে পুনর্নির্মাণ করে, অকাট্য কালপঞ্জি ও ইতিহাসের তথ্য উপাত্ত যাচাই করে লেখিকা যে সাহিত্যিক সুবাস ছড়িয়েছেন, তা যেকোনো পাঠকের হৃদয় ছুঁয়ে যাবে।

দানিয়ুবের কুয়াশাচ্ছন্ন উপত্যকা, কাজিমের দৃঢ়তা, মার্শিয়ার ব্যাকুলতা, আর নাজমার রক্তক্ষয়ী দুঃস্বপ্নের মধ্য দিয়ে লেখক আমাদের এমন এক আবেগময় সফর করিয়েছেন, যেখানে প্রতিটি পাতার সাথে সাথে হৃদম্পন্দন দ্রুততর হয়। রহস্য, রোমাঞ্চ আর অ্যাডভেঞ্চারের এমন অভূতপূর্ব মেলবন্ধনপূর্ণ ঐতিহাসিক উপন্যাস এই সময়ে বিরল বলা যায়।

আমরা আশা করি, এই বইটি কেবল পাঠকের পড়ার খোরাক

৮ ♦ মার্শিয়া দানিয়ুবের রক্তদানব

জোগাবে না, বরং তরুণ প্রজন্মের অন্তরে ঈমানি চেতনা, সুবিচার ও বীরত্বের এক নতুন চেতনা জাগ্রত করবে।

আল্লাহ তাআলা লেখিকার কলমে আরও বরকত দিন, তার এই দীর্ঘ শ্রমকে কবুল করুন এবং পাঠকপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছে দিন—আমিন।

আজমিন আক্তার ইভা

পবা, রাজশাহী

info.iffah@gmail.com

২৬/০৯/২৬



লেখকের কথা

উপন্যাসের বইয়ের ভূমিকা না থাকলেই ভালো হয় যদিও; কিন্তু কিছু উহ্য প্রশ্ন ‘কিন্তু’ সামনে রেখেই এই ভূমিকাটি রাখলাম পাঠকের জন্য।

২০১৬-১৭ থেকে ২০১৮-১৯ সাল পর্যন্ত ইসলামি প্রকাশনায় একধরনের বিপ্লব চোখে পড়েছিল। মানুষের মধ্যে বই কেনার তুমুল আগ্রহ দেখা গিয়েছিল তখন। কিন্তু সেই জোয়ারের পর পাঠকাভ্যাসে যে তীব্র খরা ও ভাটা নেমে এসেছে, তা আজও ভীষণভাবে ভোগাচ্ছে প্রকাশনা সংশ্লিষ্ট পুরো সেক্টরকে। অনেকেই এর মূল কারণ খুঁজলেও, সেই কারণগুলো নির্ণয় করা এবং তা নিয়ে পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি সেভাবে। প্রকাশনা সংশ্লিষ্ট অনেকের সাথে পরিচয়ের সুবাদে আমার ধারণা এমনই।

আমার বোঝাপড়া অনুযায়ী, নতুন পাঠক তৈরি হচ্ছে না আমাদের। আর নতুন পাঠক তৈরি না হওয়ার প্রধান সংকট—সাহিত্যের মূল ধারা, বিশেষ করে টানটান মৌলিক গল্প ও উপন্যাস নিয়ে আন্তরিক কাজের অভাব থাকা। এই একটামাত্র সংকটই আমাদের পুরো সেক্টরকে ধ্বসিয়ে দিয়েছে। কারণ, গুরুগম্ভীর তাত্ত্বিক আলোচনা বা অনুবাদ দিয়ে সাধারণ ও অপড়ুয়া প্রজন্মকে একটা নির্দিষ্ট সময় ধরে রাখা গেলেও, প্রয়োজন শেষ হলে তারা সরে যাবেই ভিন্ন দিকে। আর এটাই স্বাভাবিক। একতরফা বই দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে একটি পাঠকশ্রেণিকে বইমুখী করে রাখা যায় না; বরং তাদের কল্পনাশক্তি ও রুচিকে নাড়া দিতে প্রয়োজন শিল্পোত্তীর্ণ প্রচুর পরিমাণের মৌলিক সাহিত্য। যা আমাদের বুঝতে অনেক দেরি হয়ে গেছে।

অন্যদিকে বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক ময়দানে আমাদের উপস্থিতি বড়ই ম্লান। নিজস্ব ইতিহাস ও গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়গুলো সাহিত্যের মোড়কে তুলে ধরতে না পারায় সমাজ ও জাতীয় পরিসরে আজও অন্যের তৈরি ন্যারেটিভের আধিপত্য চলছে। আমাদের প্রতি বিদ্রোহ রাখা সাহিত্যগোষ্ঠি, বাম ও শাহবাগীদের তৈরি করা বয়ান গিলছে দেশ ও সমাজ। এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া হুট করে সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন মৌলিক সাহিত্যের শাখাগুলোতে ধীরে ধীরে হলেও ফিরে আসা। এই চিন্তা, শূন্যতা ও দায়বদ্ধতা থেকেই জন্ম ‘মার্শিয়া’র।

বইটির প্রাথমিক ভিত্তি এম. এ. সাদেক হুসাইন সিদ্দিকির একটি উরদু বইয়ের ওপর। প্রথমে ইচ্ছে ছিল অনুবাদের। কিন্তু অনুবাদের কাজ শুরু করতে গিয়েই দেখি, সেখানে ইতিহাসের কিছু মারাত্মক বিভ্রান্তি, কালপঞ্জির গোলমাল এবং ঘটনার পরম্পরা রক্ষাসহ বেশ কিছু স্পষ্ট সমস্যা রয়ে গেছে। ফলে নিছক অনুবাদের গণ্ডি ভেঙে পুরো উপন্যাসের কাঠামো, প্লট ও ভাষা নতুন করে সাজানোর চেষ্টা করি আমি। ইতিহাসের অকাট্য তথ্য ও কালপঞ্জি যাচাই করে, সাহিত্যের নান্দনিক রস ও মনস্তাত্ত্বিক গভীরতা দিয়ে, আমার সাধের মধ্যে, বইটিকে কার্যত একটি মৌলিক ঐতিহাসিক উপন্যাসে রূপান্তর করার চেষ্টা করেছি আমি। কতটুকু পেরেছি, তা পাঠকেই বলবেন।

ষোড়শ শতকের শেষভাগে দানিয়ুব অববাহিকার জটিল ভূরাজনীতি, উসমানি সালতানাতের বীরত্বগাথা এবং আত্মমর্যাদার লড়াইকে এখানে তুলে আনা হয়েছে তীব্র সাসপেন্স ও থ্রিলিং আবহে। যারা সচরাচর মোটা বই পড়তে অনীহা প্রকাশ করেন, আমার ধারণা, (ভুলও হতে পারে; ভুল হলে আপনাদের প্রতিক্রিয়া চাই;) তাদেরও পাতার পর পাতা ধরে রাখার মতো গতিশীলতায় সাজানো হয়েছে প্রতিটি অধ্যায়। (অন্তত সেই চেষ্টা আমি করেছি।)

এই উপন্যাস যদি আমাদের তরুণ প্রজন্মের অন্তরে আত্মপরিচয় ও আত্মমর্যাদাবোধের স্ফুলিঙ্গ জ্বালিয়ে দিতে পারে এবং বাংলা সাহিত্যের

পাঠকের খোরাক জোগাতে সামান্যতম ভূমিকাও রাখে, তবেই আমার এই দীর্ঘ শ্রম সার্থক হবে। এ সংশ্লিষ্ট যেকোনো অনুভূতি কিংবা পরামর্শ আমাকে মেইল করে কিংবা ফেসবুকের মাধ্যমে জানানোর বিশেষ অনুরোধ রইল। বেশি বেশি বই পড়ুন, নিজেকে সমৃদ্ধ করুন।

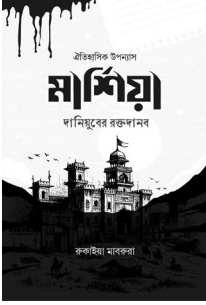
বিনীত—

রুকইয়া মাবরুরা

তেইশ | নয় | দুই হাজার ছাব্বিশ—সিরাত ইন্সটিটিউট যশোর।

rukaiyamabrura@gmail.com

facebook.com/RMabrura



এক.

১৫৯৬ খ্রিস্টাব্দের এক ধূসর শরৎকাল।

ইউরোপের দানিয়ুব অববাহিকার সীমান্ত প্রদেশ। বিস্তীর্ণ প্রান্তরের বুক চিরে চলে যাওয়া মেঠোপথ ধরে একটি তুর্কি কাফেলা নিজেদের বসতির পানে এগিয়ে চলছিল। ইউরোপের এই অঞ্চলে তখন উসমানি সালতানাতের সুশাসন প্রতিষ্ঠিত।

কাফেলার সদস্য কয়েকজন অশ্বারোহী যুবক, অভিজ্ঞ কিছু প্রবীণ এবং পর্দানশিন তুর্কি তরুণী। বোঝা বহনের জন্যও ছিল আলাদা কিছু তাগড়া ঘোড়া। নিয়ম ও নিরাপত্তার স্বার্থে মেয়েদের রাখা হয়েছিল কাফেলার মধ্যভাগে; আর সামনে-পেছনে পাহারায় ছিল সশস্ত্র পুরুষ আরোহীরা। কাফেলার সর্বাগ্রে ছিল দুই তুর্কি নওজোয়ান—কাজিম ও আহমাদ সায়িদ। পরম বিশ্বস্ত দুই সহযোদ্ধা ও বন্ধু; সীমান্ত জনপদ বায়াকের সম্ভ্রান্ত দুই মুসলিম পরিবারের নয়নমণি। সদ্য কৈশোর পেরোনো তারুণ্যের তেজে ভাস্বর দুজনেরই অবয়ব। সুঠাম দীর্ঘ দেহ, চওড়া বক্ষপট আর পেশিবহুল শক্তিশালী বাজু। চোখের গভীর দৃষ্টিতে যেমন বুদ্ধিমত্তার ছাপ, তেমনি প্রশস্ত কপালে আত্মমর্যাদার আভা।

পথ চলতে চলতে কাজিম হঠাৎ আহমাদ সায়িদের দিকে ফিরে চাইল।

: ‘এসো দোস্তু, ঘোড়ার গতি একটু বাড়ানো যাক।’

আহমাদ সায়িদ লাগাম কিছুটা টেনে ধরল।

: ‘এখান থেকে বায়াকের দূরত্ব তো আর বেশি নয়; বড়জোর দুই ঘণ্টার পথ। এত তাড়াছড়ো কীসের?’

: ‘আমার ইচ্ছে, এই পথটুকু আমরা একটু দ্রুতই পাড়ি দিই।’

: ‘বুঝছি! তোমার চঞ্চলতা বলে দিচ্ছে, তুমি মার্শিয়াকে দেখতেই দ্রুত ছুটতে চাইছ। কিন্তু কাজিম, ভুলে যেয়ো না, সে একজন ভিনদেশি খ্রিস্টান নারী।’

কাজিমের চেহায়ায় গান্ধীর্ষ নেমে এলো।

: ‘এ কেমন অদ্ভুত কথা বলছ সাইদ! তাকে দেখার জন্য আমার মন কেন ব্যাকুল হতে যাবে? আমি খুব ভালো করেই জানি, সে খ্রিস্টান। তুমি ভুল বুঝছ; তার সঙ্গে আমার অনুচিত কোনো সম্পর্ক নেই।’

: ‘সম্পর্ক না থাকাই তো স্বাভাবিক ও সমীচীন। বেশ, চলো তবে সামনে এগোনো যাক।’

: ‘চলো।’

দুজনেই জিনের ওপর সামান্য ঝুঁকে লাগাম আলগা করতেই প্রভুভক্ত ঘোড়াদুটো ইঙ্গিত বুঝে নিল। হ্রোষধ্বনি তুলে নিমেষেই তারা ক্ষিপ্ৰগতিতে ছুটতে শুরু করল। বাতাসের বেগে ধাবমান অশ্বের খুরের আঘাতে পথের ধুলোবালি উড়তে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বায়াকের সীমান্তঘেঁষা উপশহরের কাছাকাছি পৌঁছে গেল তারা। লাগাম টেনে অশ্বের গতি মন্থর করল কাজিম ও সাইদ। জনপদের সীমানায় পথটি কয়েকটি ফলের বাগিচার ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে। পথের দুপাশে প্রাচীন ওক আর উইলো গাছের ঘন শামিয়ানা। পাতায় পাতায় শরতের আর্দ্র কুয়াশা জমে যেন পুরো পথটাকেই আবছা ছায়ায় ঢেকে রেখেছে।



দ্বিপ্রহর পেরিয়ে রোদ তখন কিছুটা পশ্চিমে হেলে পড়েছে। আকাশে নির্মল আলো থাকা সত্ত্বেও এই বৃক্ষছায়ায় এক ধরনের শীতল অন্ধকার নেমে এসেছে। একটি বাঁক ঘুরতেই ওপাশ থেকে ধীর কদমে এক ঘোড়সওয়ারকে আসতে দেখা গেল। আগন্তুক খ্রিস্টান যুবকের পরনে অভিজাত সিল্কের টিউনিকের ওপর সাধারণ শিকারি আলখাল্লা; কিন্তু তার চোখের দৃষ্টি আর চিবুকের ভঙ্গিতে দান্তিকতার ছাপ স্পষ্ট। আরোহী নিকটবর্তী হতেই কাজিম ও সাইদ পথ ছেড়ে নিজেদের বাহন একপাশে সরিয়ে নিল।

যুবকের মুখাবয়ব স্পষ্ট হতেই কাজিম বিস্মিত কণ্ঠে আওয়াজ তুলল।

: ‘আরে! এ তো দেখছি সাজমান্দ!’

যুবকটি অবজ্ঞার সাথে লাগাম টেনে ঘোড়া থামাল। চোঁটের কোণে তীর শ্লেষের হাসি ফুটিয়ে চোখ ফেরাল।

: ‘জি হ্যাঁ, আমিই। বলুন, উসমানি বাহাদুরের কী হুকুম?’

কাজিম তার দৃষ্টির ভাষা পড়ে শান্তস্বরে প্রশ্ন করল।

: ‘আমাদের সামনে পড়াটা কি আপনার জন্য খুব অস্বস্তিকর হয়ে দাঁড়াল?’

: ‘অস্বস্তি নয়, তবে একটা কথা আপনাদের (মুসলিমদের) জেনে রাখা ভালো; আমরা (খ্রিস্টানরা) স্থির করেছি, এখন থেকে উসমানিদের আর সম্মান-টম্মান করব না আমরা।’

তার কথা শুনে ভেতরে জেগে ওঠা আত্মমর্যাদা নিয়ে সোজা হয়ে বসল কাজিম।

: ‘আমরা (মুসলিমরা) কি কখনো (সম্মানের এই অনুগ্রহ) চেয়েছি যে, কোনো অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি আমাদের তোয়াজ করুক?’

: ‘চাননি সত্য, কিন্তু আপনারা আমাদের ওপর শাসন কায়েম করে রেখেছেন; তাই এতদিন অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাথা নোয়াতে হতো।’

: ‘উসমানি সালতানাত কি তোমাদের নাগরিক অধিকার হরণ করেছে, সাজমান্দ? তোমাদের কি পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা দেওয়া হয়নি? কোনো উসমানি প্রশাসক কি তোমাদের ওপর বিন্দুমাত্র জুলুম করেছে, বলতে পারবে?’

সাজমান্দ মুখ বাঁকিয়ে জবাব দিল।

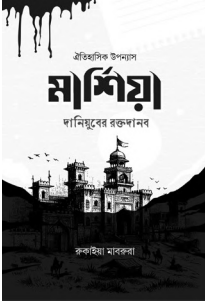
: ‘না, কোনো জুলুমের শিকার হইনি; কিন্তু পরাধীনতার গ্লানি তো মোছা যায় না। পৃথিবীতে বিজিতদের কোনো আত্মমর্যাদা থাকে না।’

কাজিম তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল।

: ‘আজ এত বছর পর আচমকা এই দাসত্বের বুলি কোথা থেকে শিখলেন, সাজমান্দ?’

সাজমান্দের চোখের কোণ কুঁচকে উঠল। সে চাপা উত্তেজনায় ফুঁসে উঠল।

: ‘সম্প্রতি আমি অস্ট্রিয়া ও জার্মানদের এলাকায় গিয়েছিলাম। সেখানে



দুই.

চলতে চলতে আহমাদ সায়েদ কিছুটা কৌতূহলী দৃষ্টিতে কাজিমের দিকে ফিরে চাইল।

: ‘মার্শিয়ার সাথে কী কথা হলো, কাজিম?’

কাজিম নির্লিপ্তভাবে জবাব দিল—

: ‘তেমন কোনো আলাপ আর হলো কোথায়? বলছিল, অনেক দিন পর ফিরলে; সুযোগ পেলে আগামীকাল একবার য়েয়ো। জরুরি কিছু কথা আছে।’

আহমাদ সায়েদের ভুরু কুঁচকে উঠল—

: ‘কী সেই বিশেষ কথা, জানতে চাওনি?’

: ‘চেয়েছিলাম। কিন্তু বলল, “এখন নয়; যখন তুমি একা আসবে, কেবল তখনই বলা সম্ভব।”’

: ‘তার ভাই যে আমাদের দেখে ফ্লোভ উগরে দিল, সে বিষয়ে কিছু বললে না?’

: ‘বলব না কেন? অবশ্যই বলেছিলাম। কিন্তু সে কথার কোনো সদুত্তর দিল না। কেবল বারবার বলল, আগামীকাল সম্ভ্রায় বাগিচায় দেখা করতে।’

আহমাদ সায়েদ মাথা নাড়ল।

: ‘অদ্ভুত তো! সাজমান্ডের হাবভাব মোটেই স্বাভাবিক ঠেকছে না।’

কাজিম ঘোড়ার গতি সামান্য মন্থর করল।

: ‘সাজমান্ডের কথার আগামাথা কিছুই তো পরিষ্কার নয়। তবে একটা কথা সে বড় জোর দিয়ে বলেছে—“আপনাদের দেখে আমার অস্তিত্বের অপমানের কথা মনে পড়ে গেল।” কিন্তু সেখানে তার সাথে ঠিক কী

ঘটেছিল, তা কিন্তু খোলসা করল না।’

: ‘আমি তো তোমার পাশেই ছিলাম, দোস্ত। তার মুখের বিষমাখা কথা শুনেই বুঝেছি, ভেতরে বড় কোনো শয়তানি চক্রান্তের বীজ বপিত হয়েছে।’

কথা বলতে বলতে তারা বায়াকের জনপদের সীমানাঘেঁষা মেঠোপথ ধরে এগোচ্ছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে রাস্তার পাশের ঘন ওক গাছের ছায়া থেকে ধীর পদক্ষেপে এক দরবেশ তাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর পরনে গভীর কালো রঙের আলখাল্লা। অবয়বে এক আশ্চর্য নুরানি আভা ও তারুণ্যের তেজ জ্বলজ্বল করছে। একটাল ঘন কৃষ্ণবর্ণ দাড়ি তাঁর প্রশস্ত বক্ষপট অবধি নেমে এসেছে। দৃষ্টি যেন অন্তরের অন্তঃস্থল ভেদ করে চলে যায়।

দুই বন্ধু মুহূর্তের মধ্যেই ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরল। এমন ব্যক্তিত্বের মুখোমুখি হয়ে তারা অত্যন্ত ভক্তি ও আদরের সাথে সালাম পেশ করল।

দরবেশ তাদের সালামের উত্তর দিয়ে তীব্র দৃষ্টিতে কাজিমের দিকে চাইলেন। তাঁর গভীর কণ্ঠে যেন গভীর সতর্কবাণী বেজে উঠল।

: ‘হক! হকই সর্বদা জয়ী হয়, আর বাতিল ধূলিসাৎ হতে বাধ্য।’

কাজিম শ্রদ্ধানত মস্তকে সায় দিল।

: ‘নিঃসন্দেহে আপনার কথা সত্য; ন্যায় ও সত্যের শক্তিই সর্বাত্মক।’

দরবেশ দূর দিগন্তের পানে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। তারপর গভীর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন,

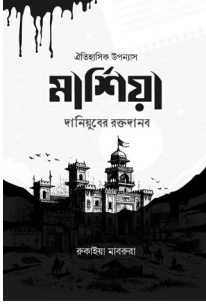
: ‘এই শাস্ত জনপদে বেশ দ্রুতই কল্যাণের সুবাতাস ছড়িয়ে পড়ছিল; কিন্তু কুচক্রীরা সেখানে চরম ফিতনা ও অভিশাপের বিষ মিশিয়ে দিতে উদ্যত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা এই জনপদের ঈমানদারদের রক্ষা করুন!’

কথাটি বলে দরবেশ পাশ কাটিয়ে সামনে অগ্রসর হতে উদ্যত হলেন। কাজিম ব্যাকুল হয়ে মিনতি জানাল।

: ‘হজরত, সামান্য একটু অপেক্ষা করুন!’

দরবেশ দাঁড়িয়ে মুখ ফেরালেন। তাঁর দৃষ্টি আরও গভীর হয়ে উঠল।

: ‘বৎস, যে-ব্যক্তি কেবল নিজের স্বার্থ আর আত্মরক্ষার কথা ভাবে, সে কখনোই প্রকৃত মানুষ হওয়ার উপযুক্ত নয়। কামেল ইনসান তো সেই, যে সৃষ্টিজগতের সবার কল্যাণ কামনা করে। আর প্রকৃত মুসলিম হচ্ছে সে,



তিন.

দ্রুত নিজের নিকাব ঠিক করে দাঁড়িয়ে রইল নাজমা। বাহন থেকে নেমে তার এগিয়ে এলো বান্ধবী রাইসা। এরপর দুজনেই কিছুটা জড়তা ও চাপা চাঞ্চল্য নিয়ে বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করল। অন্তঃপুরে পা রাখতেই মুখের নেকাব উন্মুক্ত করে দিল তারা।

রাইসার অবয়বেও ছিল নজরকাড়া লাভণ্য। সে ভ্রু নাচিয়ে ফিসফিস করে বলল,

: ‘নাজমা, এটা তুমি কী কাণ্ড ঘটালে?’

নাজমা কোনো উত্তর দিল না; তার চেহারা তখনো একরাশ বিব্রতভাব স্পষ্ট ফুটে উঠছিল। ক্ষণিক বাদে তারা অন্দরমহলের প্রশস্ত বারান্দার পানে এগিয়ে গেল। পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ নারীরা আগে থেকেই সেখানে সমবেত ছিলেন। তাঁদের মধ্যেই ছিলেন নাজমার আশ্মিজান ফরিদা। মেয়েকে এমন অপ্রস্তুত অবস্থায় আসতে দেখে তিনি সম্মেহে জিঞ্জাসা করলেন,

: ‘কী রে নাজমা, তোর আবার কী হলো?’

নাজমা অপ্রস্তুত হাসি দিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করল।

: ‘কিছু হয়নি, আশ্মিজান।’

রাইসা ঠোঁটের কোণে দুষ্টমির হাসি ফুটিয়ে বলল,

: ‘হ্যাঁ খালাজান, আসলেই কিছু হয়নি। ও তো শ্রেফ নেমে আসার সময় উপর থেকে পড়ে যাওয়ার মহড়া দিচ্ছিল!’

ফরিদা কপালে ভাঁজ ফেলে প্রশ্ন করলেন।

: ‘কোথা থেকে পড়ল আবার?’

: ‘নামার সময় একদম আছাড় খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।’

: ‘কোথাও চোট লাগেনি তো ওর?’

রাইসা নাছোড়বান্দা ভঙ্গিতে টিপ্পনী কাটল।

: ‘মহড়া দিতে গেলে কি কারও গায়ে চোট লাগে?’

: ‘থামো তো তুমি!’ নাজমা বান্ধবীর দিকে চোখ রাঙিয়ে চাপা গলায় বলল।

: ‘কিন্তু ও এমনভাবে পড়ল কীভাবে?’ ফরিদা এবার গম্ভীর হয়ে জানতে চাইলেন।

: ‘এই নাজমা, খালাজানকে আরেকবার পড়ে দেখিয়ে দাও না!’ রাইসা চোখ মটকে নাজমার দিকে চেয়ে বলল।

: ‘আরে, কী আবোলতাবোল বকছিস!’ ফরিদা ধমকের সুরে হেসে বললেন,

‘আমি তো জানতে চাইছি, ঘটনাটা কীভাবে ঘটল।’

: ‘কী জানি!’ রাইসা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল। ‘এর জবাব তো ও-ই ভালো দিতে পারবে। আমার তো মনে হয়, ওর হঠাৎ ইচ্ছা হলো মাটিতে একটু গড়াই, তাই অমন গড়াগড়ি দিল!’

: ‘নাজমা, তুই নিজেই বল তো মা, ঠিক কী ঘটেছিল?’ ফরিদা নরম সুরে জিজ্ঞেস করে নাজমার দিকে তাকালেন।

: ‘আমি জান, ভেতর তখন ভীষণ গুমোট লাগছিল।’ নাজমা দৃষ্টি নত করে মৃদুস্বরে ব্যাখ্যা দিল। ‘অস্বস্তিতে তাড়াহুড়ো করে নামতে গিয়ে পায়দানে ঠিকমতো পা পড়েনি। শুধু এটুকু মনে আছে—একটা জোর ঝাঁকুনি খেলাম, আর পরক্ষণেই নিজেকে মাটিতে আবিষ্কার করলাম। তবে আমি সাথে সাথেই উঠে দাঁড়িয়েছি।’

: ‘সেখানে পুরুষ মানুষও তো উপস্থিত ছিল?’ ফরিদা চিন্তিত মুখে বললেন।

: ‘বেশি কেউ ছিল না।’

ফরিদা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সতর্ক করলেন,

: ‘অনেক বড় অসতর্কতা হয়ে গেল! নামার সময় হাতল শব্দ করে ধরে ওঠানামা করা উচিত ছিল। তাছাড়া সফরের ধকলে তোর শরীরটাও তো পুরোপুরি চান্দা হয়নি।’

একথা বলেই তিনি রাইসার দিকে ফিরে বললেন।

: ‘রাইসা, মা আমার! তুই ওকে নিয়ে পেছনের বাগানে যা। খোলামেলা হাওয়া লাগলে শরীরটা দ্রুত চাঙ্গা হয়ে উঠবে।’

নাজমার বান্ধবীরা ফরিদাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মানের চোখে দেখে। রাইসাও তাঁকে নিজের মায়ের মতোই ভক্তি করে। সে বিনীতভাবে মাথা নেড়ে বলল।

: ‘চল নাজমা, বাগানের দিকে যাই।’

দুজনে ধীরপায়ে বাগানের সবুজ পথের দিকে হাঁটতে লাগল। কিছুদূর যেতেই রাইসা আবারও কৌতূকের সুরে বলল,

: ‘কী রে, পড়ার কায়দাটা আরেকবার দেখাবি নাকি?’

: ‘আমি কি ইচ্ছে করে পড়েছি?’ নাজমা ক্ষুব্ধ চোখে তাকিয়ে জবাব দিল।

: ‘আচ্ছা! তবে সামনের দিকে এমন কী দেখেছিলে যে চোখ সরাতে না পেরে অমনি পা হড়কে ধরাশায়ী হলে?’

: ‘বধির হয়ে গেলে নাকি? বললাম তো, বাঁকুনি খেয়ে হঠাৎ পা পিছলে গেল।’

: ‘অত গরম লাগলে আরেকটু সবুর করে নামতি।’

: ‘তা ঠিক; হুড়মুড় করে নামতে যাওয়াটা আমারই ভুল হয়েছে।’

রাইসার চোখের কোণে কৌতূহলের ঝিলিক খেলে গেল।

: ‘আমি যখন দেখলাম তুই পড়ে গেলি আর তোর মুখের নেকাব খসে পড়ল, আমার বুকের ভেতর তো ছ্যাঁৎ করে উঠেছিল। কিন্তু দেখলাম, তাকে মাটি থেকে টেনে তুলতে ওই নওজোয়ানের তৎপরতাই ছিল সবচেয়ে বেশি।’

নাজমার চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। সে বিস্মিত কণ্ঠে বলল।

: ‘কী বলছিস! আমাকে এক নওজোয়ান হাত ধরে তুলেছে? ভাইজান তোলেননি?’

: ‘ভেবেছিস তুই ছাড়া দুনিয়ার সবাই বোকা?’

নাজমা কসম খেয়ে বলল।

: ‘আল্লাহর কসম, আমি সত্যিই ভেবেছিলাম ওটা ভাইজানের হাত!’

: ‘প্রথমে যখন লোকটা তোকে টেনে ওঠাল’, রাইসা মাথা নেড়ে বলল,

: ‘দজ্জাল মেয়ে! বড় কামরায় গিয়ে সোফায় আয়েশ করার মজা এবার হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিস?!’

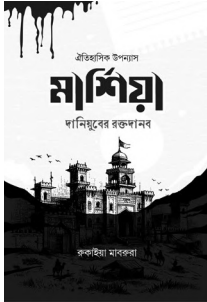
রাইসা নিজের বুক চেপে ধরে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল।

: ‘খোদার কসম, আমি কি জানতাম নাকি সেখানে কোনো অচেনা পুরুষ শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে?!’

নাজমা ওড়না ঠিক করতে করতে বলল।

: ‘আর এক মুহূর্তও এখানে নয়, সোজা অন্দরে চল!’

দুই বাফবী লজ্জায় লাল হয়ে মাথা নিচু করে দ্রুত বাড়ির অন্দরমহলের পথ ধরল।



চার.

একাগ্রচিত্তে এশার নামাজ আদায় করল নাজমা। নামাজ শেষ করে জায়নামাজ গুটিয়ে নাজমার পাশে এসে বসল রাইসাও।

: ‘ক্ষুধা পেয়েছে নাজমা? খাবে কিছু?’

: ‘তুমি খেয়ে নাও রাইসা; আজ আমি খাব না।’ নাজমা মৃদু মাথা নেড়ে বলল।

: ‘তুমি না খেলে আমিও খাব না।’ রাইসা অভিমানের সুরে বলল।

: ‘আজব তো! খাবার নিয়ে এমন জেদ করছ কেন?’

: ‘তাহলে স্পষ্ট করে বলো, কেন খাবে না?’

: ‘কী আর বলব? শরীরটা কেমন যেন ম্যাজম্যাজ করছে; মুখে কিছুই

রোচেনি।’ নাজমা বালিশে হেলান দিয়ে ক্লান্ত কণ্ঠে বলল।

: ‘অতিরিক্ত রূপবতী হওয়াও কিন্তু ঝামেলার বিষয়! আমার তো মনে হয় নির্ধাত কারও নজর লেগেছে তোমার ওপর।’ রাইসা তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে মুচকি হাসল।

নাজমা বান্ধবীর রসিকতায় আলতো হেসে ফেলল। মুক্তোদানার মতো শুভ্র দাঁতের সারি ক্ষণিকের তরে ঝিলিক দিয়ে উঠল। সে হালকা তাচ্ছিল্যের সুরে বলল।

: ‘আমার ওপর কুবাতিস বা নজর লাগবে? এত বড় মানুষের গায়েও কি ও-সব আছর করে?’

: ‘নজর শুধু দুধের শিশুদের লাগে না রে সখী; বয়োঃপ্রাপ্তদের ওপরও পড়ে। আর মাশাআল্লাহ, তোমার তো এখন কারও নজর কাড়ার মতোই বয়স!’

ঠিক সেই মুহূর্তে পর্দা সরিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন মা ফরিদা। রাইসার শেষ কথাটা তাঁর কানে যেতেই তিনি গম্ভীর মুখে বললেন।

: ‘রাইসা কিন্তু ভুল বলেনি; আমারও মন বলছে নাজমার ওপর কারও দৃষ্টি লেগেছে।’

নাজমা মুখ তুলে চাইল।

: ‘কিন্তু আন্নিজান, বড়দেরও এমন হয়?’

ফরিদা কপালে হাত রেখে বললেন।

: ‘হবে না কেন? এই যে রাত হয়ে গেল, এখনো পেটে এক লোকমা খাবার পড়ল না!’

: ‘এখনো মুখে ক্ষুধা আসেনি আন্নিজান।’

: ‘এ-জন্যই তো বলছি, মহল্লার প্রবীণ তাবিবকে দেখিয়ে নেওয়া দরকার; তিনি নাড়ি পরীক্ষা করে বুঝতে পারবেন।’

নাজমা অনিচ্ছার সাথে বলল।

: ‘কিন্তু আমি তো অসুস্থ নই আন্নিজান!’

: ‘অসুস্থ না হলে ক্ষুধা উবে যাবে কেন শুনি? সফরের ধকল হলেও তো শরীরের কিছু যত্ন দরকার।’

: ‘হাকিম সাহেব তো ঘরে আসামাত্রই কোনো কিছু না বুঝে একগাদা

তেতো জোশান্দা আর কাথ গিলিয়ে দেবেন!’

ফরিদা মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে হেসে বললেন।

: ‘পাগলী মেয়ে! অভিজ্ঞ হাকিম কি রোগ নির্ণয় না করেই ভেষজ দাওয়াই বাতলে দেন?’

: ‘শুধু বাতলেই দেন না, জোর করে গিলিয়ে তবেই ছাড়েন! আমার ও-সব তেতো আর কড়া গন্ধের ওষুধ একদম সহ্য হয় না।’

: ‘বড় বড় শাহজাদীদেরও তো অসুখ-বিসুখে নিয়ম মেনে দাওয়াই সেবন করতে হয়।’

নাজমা চাদর টেনে নিয়ে বলল,

: ‘শাহজাদীদের কথা আলাদা আন্মিজান; আমার দ্বারা ওই তেতো দাওয়াই খাওয়া একেবারেই অসম্ভব।’

: ‘সেটা পরে দেখা যাবো।’ ফরিদা নরম কিন্তু দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, ‘এখন কোনো অজুহাত চলবে না; উঠে কিছু মুখে দাও।’

: ‘আচ্ছা, আপনি বললে অল্প কিছু খাচ্ছি।’

ফরিদা বাইরে গিয়ে বাঁদীদের ডেকে পরিপাটি করে খাবার পরিবেশনের নির্দেশ দিলেন। দুই বান্ধবীর সামনে দস্তরখান বিছিয়ে নিজের উপস্থিতিতেই রাতের খানা শেষ করালেন।

খাবার শেষে শরীরের জড়তা কাটাতে তারা দুজন কিছুক্ষণ অন্তরমহলের খোলা আঙিনায় পায়চারি করল।

শরৎকালের পূর্ণিমার রাত। আকাশের বুক চিরে রূপালি জ্যোৎস্না বারে পড়ছে চারপাশের মেঝেজুড়ে। ধবধবে চাঁদের আলোয় বাগান আর চাতাল যেন এক মায়াবী রূপ ধারণ করেছে। কিছুক্ষণ নির্মল বাতাসে হেঁটে তারা নাজমার ছোট শয়নকক্ষে প্রবেশ করল। রাইসার ছোট খাটিয়াটিও আজ এই ঘরে এনে পাতা হয়েছে। ক্লান্ত শরীরে দুজন নিজ নিজ বিছানায় গা এলিয়ে দিল। কোণের নিচু কাঠের স্ট্যান্ডে রাখা মাটির পিদিমে জলপাইয়ের তেল জ্বলছিল। মৃদু আলো আর ছায়ার মাঝে ধীর ফিসফিসানিতে কথা বলতে বলতে একসময় তাদের চোখ জড়িয়ে এলো ঘুমে। এক পরিচারিকা নিঃশব্দ পদক্ষেপে কামরায় এসে পিদিমের শিখার ওপর একটি সূক্ষ্ম পিতলের ঢাকনি বসিয়ে আলোর তেজ কমিয়ে দিয়ে গেল।